HAMIR

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

হামির

গার্গী ভট্টাচার্য

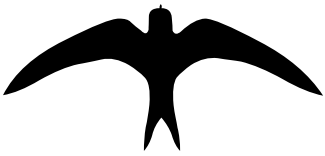

আমার সারাদিনের বন্ধু, পাখিদের ---

হামির

এই গল্প এক ভারতের মানুষের ; যার নাম হামির দেব । উত্তর ভারতের এক নগর, যা আগে বাংলার মধ্যে ছিলো সেই নগরের মানুষ হামির বহুদিন হল পরবাসে আছে ।

আগে নিজ শহর- ছবিলগড়ে ছিলো বাসা ।

পরবর্ত্তী জীবন কাটে পরবাসে ।

বিদেশে অনেকদিন যাবৎ থাকার পরে একদিন হঠাৎ-ই কাউকে কিছু না জানিয়ে দেশে ফিরে যায় হামির । যদিও বিদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলো তবুও সে আর ফিরবে কিনা তাই নিয়ে পরবাস উত্তাল ! বিদেশী মিডিয়াতে ক্রমাগত খবর বেরোচ্ছে যে হামির আর ফিরবে কিনা ও ফিরলে কী হবে ।

পুলিশ ও প্রশাসন তটস্থ হয়ে আছে ।

হামির দেব ফিরে গেছে মাস তিনেকই হয়েছে । এরই মধ্যে লোকে ভাবতে শুরু যে সে আদৌ ফিরবে কিনা আর ফিরলে কোন সে মহাভারত উপস্থিত হবে !

আসলে গল্পটা খুবই শক্ত একটা পটভূমিতে রচিত । রচনা করেছে হামিরের ভাগ্যচক্র । নাহলে বিদেশের স্পর্শে সভ্য-ভদ্র হয়ে ওঠা মানুষটি হঠাৎ কী করে এরকম এক কান্ড করে বসলো তাই নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কোনো হদিস্ পাওয়া যায় না এই ব্যবহারের । নম্র ও ভদ্র এই মানুষটি কেমন যেন এক রাতের ফাংশানে এসেই বদলে গেলো ।

বদলই একমাত্র স্থায়ী এই দুনিয়ায় কিন্তু হামিরের বদলের কায়দা ও নিয়ম ভিন্নজাতের । তাই মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়েছে তাকে নিয়ে ।

আসলে সেদিন ছিলো ঘোর অমাবস্যা ।

ক্যালিস্টা শহরের অনতিদূরে, এক ফার্মহাউজে হামিরের দেখা হয়েছিলো এক কিশোরীর সাথে । সদ্য ফোটা ফুলের মতন এই মেয়েটি সবে কিশোরী হয়েছে । এখন তার স্বাধীন জীবনে যাওয়ার কথা কিন্তু তার জন্য যেন ওঁৎ পেতে বসেছিলো ভয়াল মৃত্যুর ফাঁদ !

মরতে সবাই ভয় পায় । কাজেই এই বাচ্চা মেয়েটি যে মৃত্যুকে সাদরে বরণ করবে না তা বলাই বাহুল্য ।

সেদিনের সেই ফাংশান ; **রাতের কালো পোশাক** সম্পর্কিত । কেন রাত এত গাঢ় , কেন অমাবস্যায় মনে হয় কবে চাঁদের আলো আবার ভুবন ভরাবে ! কেন রাতের কালো গহ্বরে মানুষ ঘুমিয়ে শান্তি পায় তবুও রাতকে রাজকন্যে রূপে বরণ করতে অনিচ্ছুক । এইসব ব্যাপার নিয়ে শুরু হয় পার্টি । সবাই কালো পোশাক পরে হাজির হয়েছে ।

নানান মানুষ নানান গল্প বলছে , গান করছে । ইত্যাদি । মদের ফোয়ারাও বইছে । কাছেই ওয়াইন ফার্ম । কাজেই ভালোমন্দ ওয়াইন ভুবন মাতাচ্ছে । যারা বিয়ার ও মদ্যপান করেনা তারা ফলের রস পান করছে । এই ফলের রস কিন্তু এই ফার্মেই তৈরি হয়েছে । **তরমুজ, গাজর, টমেটো, আঙুর, নানান বেরি ও আপেল সবকিছুর রসমালা সাজিয়ে বসেছে ফার্মের মালিক ক্লাউট । ক্লাউট ক্লিক নাম তার ।**

লোকে মজা করে বলে :: ওহে ! এটি তোমার ছদ্মনাম নাকি বটে ? ক্লিক তো আগে এত পপুলার ছিলো না । সফট্ওয়্যার জমানায় নাম করেছে ছোট্ট ক্লিক্ ।

হেসে ওঠে খুব ক্লাউট । বলে :: আরে না না আমার বংশই ক্লিকের বংশ । হয়ত ফটো তোলা শুরু হবার পরে কেউ এই উপাধি পায় । আমি সঠিক জানিনা ।

ফটো তাও ব্ল্যাক্ অ্যান্ড হোয়াইট । কারণ ক্লাউট এমন এক মানুষ যে রং জোছনায় ভাসতে নারাজ । সে রং-কে ঘৃণা করে । সে এক আজব মানুষ । বলে :: আই হেট্ কালারস্ । আই হেট্ ডিজাইন । আই হেট্ পিক্চারস্ ।

জগতে এরকম মানুষও আছে ; যে রং ও চিত্রে চিত্রিত হতে নিমরাজি তাইনা দেখে অনেকেই অবাক হয় । সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে সবাই রংচং ও উজ্জ্বলতা পছন্দ করে । কিন্তু বাস্তবে তা হয়না । অন্ধকার ঘিরে থাকে এরকম মানুষ যেমন আছে সেরকম **রং হীন জীবনে** আগ্রহী এমন মানুষের দেখাও মেলে কখনো । সংখ্যায় কম হলেও ।

আজকে এই ফাংশানেই দেখোনা ! পুরো হল সাজানো হয়েছে সাদা ফুলে আর কালো পোশাকে । আজব ব্যাপার তাই না ?

ক্লাউট প্রায়ই বলে থাকে যে যেকোনো রং কালোর ওপরেই খোলে বেশি । কাজেই সে কমন রং এর সাথে আছে । বেশি বিমূর্ততায় না গিয়ে । আর এটাও বলে যে গাঢ় হতে হতে, মানে ঢলে যেতে যেতে সব রং-ই নাকি লাস্টে কালো হয়ে যায় । **কাজেই সে গন্তব্যেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে ।**

এহেন ফাংশানে, সেই বাচ্চা মেয়ে একবার হামিরের দাড়িতে হাত দিয়ে ফ্যালে মজা করে ।

হামিরের বেশ শৌখিন দাড়ি । সেইটাতে- হাল্কাভাবে হাত বুলায় মেয়েটি ।

তখন হামিরের কোনো ইমোশান্স দেখা যায়না ।

কিন্তু পরে মেয়েটিকে নিয়ে ছবিলগড়ে যায় ।বেড়াবার নাম করে । তার মা এবং অন্য দুই ভাইও গিয়েছিলো । সবাই কিশোর কিশোরী । মেয়েটি যাকে ডেট্ করতে শুরু করেছে সেও গিয়েছিলো । মোট পাঁচজন হামিরের নগর ছবিলগড়ে যায়, ওর সাথে । **মধ্যবয়স্ক হামিরের অন্যরূপ দেখা যায় সেখানে ।**

মেয়েটিকে মেরে ফেলা হয় । দাড়িতে হাত দেবার অপরাধে । কারণ হামিরের ছবিলগড়ে নাকি- মানুষের এত অহং থাকে যে কেউ দাড়ি অথবা চুল ধরে টানলে তাকে অতি অসম্মানজনক মনে করা হয় এবং তার জন্য সেই মানুষের প্রাণ নেওয়াকে পরম শুভকর্ম বলে ধরা হয় । বিদেশে যে যাই মনে করুক না কেন !

ছবিলগড় এক পুরাতন নগর । প্রায় ৬০০/৭০০ বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে বেঁচে আছে আজও । বেশিরভাগ মানুষই আদিবাসী । তাদের নিজেদের কালচার আছে । আর রাজা হিসেবে কিছু ভূমিজ মানুষ ওদের শাসন করতো । সেরকমই এক মানুষ হামির দেব ।

ওরা বংশ পরম্পরায় ছবিলগড়ের রাজা ।

ব্রিটিশ শাসন শেষেও ওরা রাজার সম্মান পায় ।

আগে বাঈজী নাচিয়ে দিন কাটাতো আর চাষবাস ও পশুপালন করতো । এখন ব্যবসা করে । কেউ ট্রাইবাল সংক্রান্ত কিছু এথনিক্ দ্রব্যের ব্যবসা করে তো কেউ ফসলের আর কেউবা পুজোপাঠের । আজকাল অনলাইন পুজো দেয় লোকে । অন্যের হয়ে পুজো করে প্রসাদ ও মালা ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিদেশে । কেউবা নানান যজ্ঞ করে বিভিন্ন টালিস্মান তৈরি করে বিদেশে পাঠায় । **ভালই লাভ হয় দিনশেষে- কারণ ডলার, ওয়রো, পাউন্ডে রোজগার করে ওরা!** সত্যিকারের

পুজো হচ্ছে- নাকি গোটা ব্যাপারটাই ফাঁকি সে আর কে দেখছে আর খোঁজ করছে ? আজব সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের আশায় মানুষ, সুদূর পরবাসে বসে ডিভাইন শক্তির ওপরে ভরসা করতে ইচ্ছুক আর এই ছবিলগড়ের আছে কাকেশ্বরী মায়ের তীর্থস্থান ।

এই মা ; নতুন কোনো সংযোজন নন সন্তোষী মাতার মতন । ইনি আমাদের সতীমায়ের এক আজব অঙ্গ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন । স্থানটি গুপ্ত- কারণ সতীমায়েরও যে এই দেহাংশ হতে পারে তা কেউ আগে বোঝেনি ।

নাস্তিকেরা অবশ্যই এই মন্দিরে যায় মজা দেখতে । কারণ তারা বলে যে এই মন্দিরের কনসেপ্ট যে দিয়েছে সে এক মহাবিপ্লবী । তাকে আদতে প্রণাম করতে যায় তারা ।

আসলে এই মন্দিরে নাকি সতীর **মুখবিবরের টিউমার** পড়েছিলো । মানুষের টিউমার হতে পারে আর দেবীর পারে না ? এত মানুষের গায়ের গন্ধ নিলে এক আধটা টিউমার দেখা যেতেই পারে ! স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেব , লাহিড়ী বাবাও তো অসুখে ভুগেই !!! মানে টিউমারে ভুগেছেন । তাহলে সতী মা কোন সে ঢাল পড়েছেন ? কাজেই নাস্তিকেরা মজা দেখতে গেলেও অনেকে ভক্ত হয়ে গেছে এমনও শোনা যায় ।

তবে এই মন্দিরে অসংখ্য ভক্ত নিত্য আনাগোনা করে কাজেই একটা বড়সড় ব্যবসা চাগিয়ে উঠেছে । অনেকে সেই ব্যবসাকেই আরো বড় করতে পরবাসে জিনিস পাঠায় ।

ক্রমশ ধনী হয়ে ওঠে !!!

আদিবাসীরাও এখানে, মূল সমাজের লোকের সাথেই পূজা ইত্যাদিতে অংশ নেয় ।

একবার নাকি এক রাজাকে- কে গায়েব করে দিয়ে নিজের দলের লোককে সেখানে বসায় । কিন্তু সেই লোকটির রাজ্যশাসনের দক্ষতা না থাকায় অবশেষে তাকে গদি ছেড়ে দিতে হয় । সেই গদিতে বসে এক নারী , রূপছায়া । তারই সন্তানেরা আমাদের হামিরের পূর্বপুরুষ ।

এক রাণীসাহেবা ওদের বংশের প্রথম আলো । এই রাণীই ওদের বংশের হাল ধরে । আগে ওরা ছিলো নিতান্তই বুনোদের রাজা-- থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটা , ধপ্‌ করে বসে পড়া , উচ্চস্বরে হাসি আর ঢপ্‌ করে শুয়ে

পড়তো । পরে ওরা বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শিখে , নানান কেতাদস্তুর পোশাক পরা শিখে হয়ে ওঠে সত্যি রাজা, অভিজাত ।

রূপছায়া ছিলো প্রজাবৎসল । ছবিলগড়ের জন্য অনেক কিছু করেছে সে । তারপর থেকেই ওদের পরিবারের লোক আধুনিক হয়ে ওঠে ।

আদতে সতীমায়ের যে টিউমার পড়েছিলো সেটা লোকসমক্ষে আনে রূপছায়াই !

বলে :: :::::কামাখ্যায় মায়ের পিরিয়ড হয় । তাহলে দু -একটা টিউমার থাকলে ক্ষতি কী ? হয়ত মা কোনো ভক্তের অসুখ, নিজ দেহে ধারণ করে জগৎ সংসারকে দেখাতে চেয়েছেন যে সবাই আদৃত ; কসমিক্ মাদারের কাছে !

রূপছায়ার তারিফ না করে পারেনা- বিদগ্ধজনেরা ।

সত্যি, এই নারী না থাকলে এতবড় একটা রহস্য চিরটাকাল রহস্য হিসেবেই থেকে যেতো ।

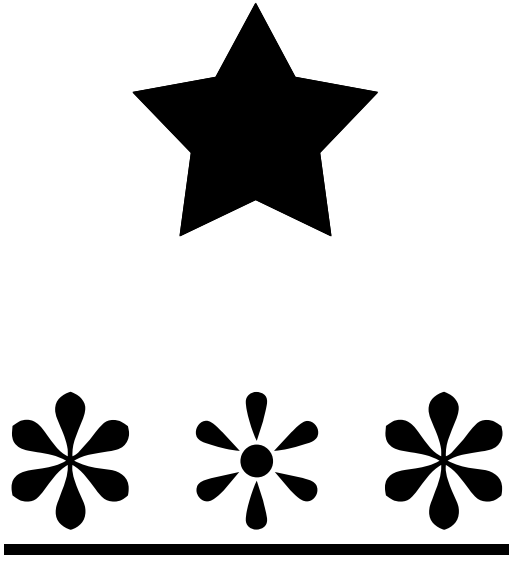

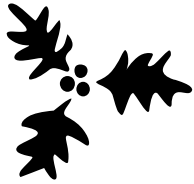

রূপছায়ার বিয়ে হয়েছিলো অদ্ভুতভাবে । ওদের দলে ; মানুষ অতিথিকে অসম্ভব গুরুত্ব দেয় । অতিথি ওদের ঈশ্বরের মতন । তার খাতির করা ও তাকে সম্মানিত করাই ওদের লক্ষ্য । **যেন সাক্ষাৎ কোনো দেবতা এসেছে ওদের গৃহে ।** ওরা এইভাবেই অতিথিদের নিয়ম অনুসারে আদর-যত্ন করে । শত্রু- অতিথি হয়ে এলেও ওরা তাদের মারেনা । বরং আপ্যায়ন করে ।

রূপছায়াকে, যেই বীরপুঙ্গব বিয়ে করতে চায় সে ছিলো ওদের জাতশত্রু । এক নিম্নশ্রেণীর মানুষ । কিন্তু শত্রু হয়ে না ঢুকে সে বন্ধু/অতিথি হয়ে ঢুকে পড়ে ওদের মহলে । ফলে বিয়ে দিতে বাধ্য হয় পূর্বজরা ও কূল পুরোহিত । এখন যেই বংশ ওদের রয়েছে তা আসলে আদিবাসী ও রাজার মিলনে বয়ে চলেছে ।

ওরা বলে ওদের রক্ত গাঢ় লাল । ওদের লাল রক্ত আর আদিম মানবের কালো রক্ত মিলে- ওদের বর্তমান প্রজন্মের মানুষের রক্ত হয়ে গেছে গাঢ় লাল ও সুন্দর !

সতীমায়ের মন্দিরে, মাসে একবার বলি দেওয়া হয় । দেবার কথা নরবলি কিন্তু রূপছায়া সেই প্রথা বন্ধ করেছে । এখন পাঁঠা কিংবা হাঁস বলি দেয় ।

সেই মন্দিরেই ,আরেক অমাবস্যায় নরবলি দিলো হামির দেব । বংশমর্যাদায় যেন বিন্দুমাত্র কালির দাগ না লাগে সেসব দেখে শুনে নরবলি দেওয়া হয়েছে ।

আর বলির খবর পেয়ে পরবাস উত্তাল !

তাদের দেশ থেকে, এক কিশোরীকে -ছলেবলে কৌশলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি দিলো এক আপাতঃ দৃষ্টিতে সভ্য মানুষ আর কেউ কিছু করবে না তাই কি হয় ? তাই সবাই আজ ক্ষেপে উঠেছে এই ঘটনা নিয়ে ।

আজ হামিরের পরিবারের, ফেসবুকে যাওয়া দায় । অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেখে দেখে ওর সন্তানেরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে । কিন্তু হামির পরবাসে আর ফেরেনি । হয়ত আর কোনোদিনই ফিরবে না । নিজের সন্তান সন্ততিকেও আর কোনোদিন দেখবে না !!

ভারতে এই নিয়ে কেউ কিছু করবে না কারণ এগুলি রিলিজিয়াস্ সেন্টিমেন্টের ব্যাপার সব আর কিছু করলে বলবে যে ধম্মে কম্মে সরকার বাধা দিচ্ছে তাই ।

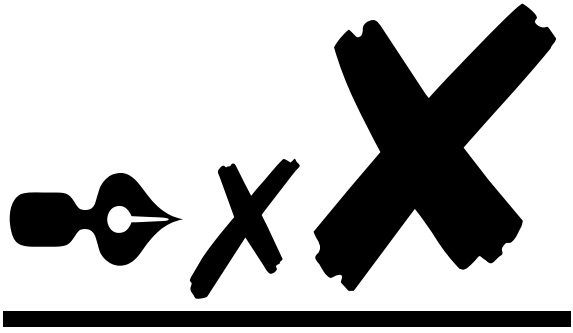

হঠাৎ ; নরবলি দেওয়া আজব কোনো ঘটনা নয় । ছবিলগড়ে এরকম আগেও হয়েছে । অহং ; মানুষের এক অনবদ্য ছাতা । সেই ছাতাতেই ঢাকা বিশ্বসংসার । কাজেই ছাতা ফুটো করতে এলে তাকে মরতে হবে । শিশু, কিশোর অথবা বুড়োমানুষ যাই হওনা কেন !

এক একটি জাতির এক একরকম সংস্কার । সেটা ভালো না খারাপ কেউ জানেনা । যুগযুগান্ত ধরে এসব মেনে চলেছে বহুলোক । কিন্তু পরবাসীদের কাছে এ-

হল খুনের নামান্তর মাত্র । তাও ওদের জাতির মেয়েকে যখন করা হল, তখন ।

পুরো দেশের লোক ক্ষেপে উঠেছে । এ কোন ধরণের অসভ্যতা ? সভ্যতার আড়ালে ?

বাঙালীরা বলছে :: ছবিলগড়ের মানুষের রক্তে বনজ রক্ত মিশেছে তাই ওরা এরকম করছে । আর ওরা মোটেও বাঙালী নয় ।

সবাই একপ্রকার ওদের ত্যাগ করছে -যারা ভারতীয় !

নানা মুণির নানা মতের মাঝেই সবাই অপেক্ষা করে আছে হামিরের পত্নী , মধুলিকার পরবর্ত্তী পদক্ষেপের জন্য । সবাই মনে করছে যে হামির এলেই তাকে সরকার বাহাদুর গ্রেফতার করবেন । তাই হয়ত সে আর আসবেই না । তাই তার স্ত্রী মধুলিকা আবার বিয়েশাদি করতে পারে । সেই স্বামী বিদেশী হবে না দেশী সেটাই এখন দেখার ব্যাপার ।

মধুলিকার নিজের পরিচয় আছে । স্কুলে পড়ায় । একজন শিক্ষিকা । শিশুদের ইশ্‌কুলে পড়ায় । পয়সার অভাব না থাকলেও সময়টা কাটানোর জন্য শিক্ষা জগতে ঢুকেছে । এখানে শিশুদের খুব ছোট থেকে

সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয় । কে কী পারে , কার কী কী স্কোপ আছে সমস্ত স্কুলেই শেখায় ।

মধুলিকা কাজ করে আনন্দ পায় । নিজের কাজের জগতে থাকতেই বেশি ভালোবাসে ।

ওদের মেয়ে ডেটা হ্যান্ডেলিং নিয়ে পড়েছে । এসব নতুন ফিল্ড । কম্পিউটারের এই যে এতশত ডেটা সেসব কি উপায়ে মানুষ বর্জন করবে যাতে কেউ কারো ক্ষতি করতে না পারে, অযথা গুপ্ত ডেটা নিয়ে তাই নিয়েই কাজ করে মেয়ে লোলিটা । **ডেটা ওয়েস্ট হ্যান্ডেল করা লোলিটা আবার একজন সফল চেস্ প্লেয়ার ।** গর্ব করে হামির নিজের মেয়েকে নিয়ে । তবে একটা স্বভাব ওর না-পসন্দ । লোলিটা ; আমের খোসা শুদ্ধু খায় । গরমে, মনোলোভা আমের মধ্যে ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে খোসা সমেৎ খেয়ে ফেলে । এই অভ্যাস কিছুতেই বদলায় না । মেয়েকে অনেকবার বারণ করা সত্ত্বেও সে শোনে না । হামিরের ইজ্জৎ যায় এতে ।

লোকে ওকে কাউ বলে হাসাহাসি করে । বলে মাদার কাউ ।

তবে ইদানিং ওকে, লোকে হোম ব্রেকার বলছে । এক ভারতীয়র ঘর ভেঙেছে ওর জন্য ।

ভদ্রলোকের স্ত্রী, অন্য শহরে আছে । লোলিটা কাজের আছিলায়- সেই ভদ্রলোকের হোটেল রুমে গিয়ে উঠেছে । তারপর থেকে একসাথে ছিলো ।

পরে সে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ায় ভদ্রলোক ওকে আশ্বাস দিতে থাকে যে ওদের মিলন হবেই ।

লোকটির নাম, আশ্চর্যভাবে লোলিটার মায়ের নামের মতন । ওর নাম মধুর পেন্সে ।

প্রেগন্যান্ট লোলিটার কথা শুনে ঝামেলা শুরু করে মধুরের পত্নী । মধুর বিচ্ছেদ চায় ।

সহজে বিচ্ছেদ না দিলে, নিজের স্ত্রী বিরুদ্ধে পাগলামির অভিযোগ আনে । স্ত্রী নাকি ওকে শয্যায় দেখলে ভয় পায় । নিজের কন্ট্রোলে না থাকা মধুর তখন স্ত্রীকে নিয়ে দারুণ বিব্রত হয় । তাই এই বিচ্ছেদ চায় ।

ভদ্রমহিলা, যার নাম চন্দ্রকলি সে এই অভিযোগ শুনে এতই মর্মাহত হয় যে এককথায় ডাইভোর্সে রাজি হয়ে যায় । আগে বলেছিলো যে মধুর কিছুতেই আবার বিয়ে করতে পারবে না কারণ সে ওকে ছাড়বে না কিন্তু এই জাতীয় এক মিথ্যে শুনে একপ্রকার ওকে ছেড়ে দিয়ে

বাঁচে । যে মানুষ, এক পরনারীর জন্য নিজের বিবাহিতা স্ত্রী সম্পর্কে এমন বিশ্রী এক অপবাদ বাজারে ও কোর্টে ছড়াতে সক্ষম, তার সাথে জেদ করে থাকার কোনো মানেই হয়না ।

মানুষটির মতিভ্রম হয়েছে । সোনাকে পিতলে বদলাতে চাইছে, নিজের লাস্টের কারণে । কাজেই একে নিয়ে পথচলা বৃথা!

বিচ্ছেদ হয়েই যায় আর লোলিটা হয় কাউ থেকে হোম ব্রেকার ।

হামিরের বলি দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটার পাশাপাশি লোলিটা তিনবার মা হয়েছে।

শিশুগুলি সোনার মেয়ে ! মায়ের ও বাপের পাপ-তাদের স্পর্শও যেন না করে ! নিষ্পাপ শিশুর দল। ওদের যেভাবে গড়বে ওরা সেরকম হবে।

তবুও বিধির বিধান হয়ত আছে; তাই মধুর হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। ভেতরে ভেতরে হয়ত নিজের প্রথমা স্ত্রীর সাথে অন্যায় বিচ্ছেদকে মেনে নিতে পারেনি। যদিও তার শ্যালিকা এসে গর্ভবতী লোলিটাকে টেনে, হিঁচড়ে এমন মারধোর দেয় যে তার একটি সন্তানের দৈহিক বাড়ে কিঞ্চিৎ সমস্যা দেখা দেয়। আদতে বাচ্চাটির মাথায় চোট লাগে এতে।

ঈষৎ জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মায়। বোঝে সবই, কথাও বলে তবুও কথা যেন জড়ানো।ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তবে এসব কিছুই না। হামিরের বলি দেওয়ার পাশে।

মধুরের মৃত্যুর পরে নাকি ওর শ্যালিকা বিরাট পার্টি দেয়। যার থিম্ হয় :: লন্‌লি ??

লোনলি নয় লন্‌লি । অর্থাৎ তুমি কি অতিরিক্ত সবুজ ? সতেজ ? রং বেরং এর পুষ্পে ভরা ?

ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না । তাহলে মধুর পেন্সের মতন অবস্থা হবে তোমার ।

পার্টিতে সবাই মধুরের ফটোতে কালি ছেটাচ্ছিলো । কেউ কষে জুতো পেটা করছে ওকে ! ছবিতে ।

শুকনো ফুল দিয়ে ওকে ঢেকে দিচ্ছিলো । ঝরে পড়া ম্যাপেল পাতা দিয়ে ওকে ঢেকে, গালি দিচ্ছিলো ।

--হোয়্যার ইজ ইওর পেন হে ??

--হোয়াট দা ফাক্‌ ম্যাডুর ? ম্যারিং ওয়ান স্লিপিং উইদ অ্যানাদার ?

--ম্যাডুর ইজ আ বাস্টার্ড । হি ইজ দা ফাদার অফ্‌ অল দা অর্ফ্যান্স ।

এইসব বলে ওকে গালি দিয়ে পালিত হল পার্টি ।

তবুও বলবো, সবচেয়ে দু:খের বুঝি লোলিটার এরপরের জীবন ! হামিরের কান্ডের পরে ওর চাকরি যায় । কোম্পানি ওকে বাতিলের পিঙ্ক স্লিপ ধরিয়ে দেয় । কোথাও আর সে একটা ছোটমোট কাজও

জোটাতে পারেনা ! কেউ ওকে চায়না , শিশুগুলি দুধ পর্যন্ত পায়না । উপোস করে করে কাটায় সবাই ।

তখনই এক আন্তর্জাল ভিডিও যা ডার্ক ওয়েবে আসে ; সেই ভিডিও দেখে কাজের দরখাস্ত করে লোলিটা । ডার্ক ওয়েব হল আমাদের নর্মাল ওয়েবের প্যারালাল আরেকটি ওয়েব যেখানে বেআইনি ওষুধ, ক্রাইম, পর্ণো ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় ।

এক বন্ধুর বাসায় এই ওয়েব আবিস্কার করে লোলিটা । সেই ওয়েবপেজে, পর্ণস্টারের অ্যাড দেখে অ্যাপ্লাই করে । তার আর উপায় নেই । তিনটে বাচ্চা , অভুক্ত থেকে থেকে মারা যাচ্ছে । মা হয়ে এই জিনিস দেখা প্রায় অসম্ভব । হামিরকে সরকার খুঁজছে । মধুর মারা যেতেই ওর শ্যালিকা ও শ্বশুর বাড়ির লোক ওকে নিয়ে আজব সমস্ত কাজ করছে । আর লোলিটাকে কেউ কাজ দিতে চাইছে না ।

এমন অবস্থায় ওর ব্রেন ওয়াশ করে ওর বন্ধু যার বাড়িতে সে ডার্ক ওয়েব দেখেছে ।

বলে :: প্রতিটি এক্সপোজের জন্য ৫০০০ ডলার করে দেবে । লাইভ অ্যানালে আরো ইনকাম্ । লোলিটার গড়ণ ও উচ্চতা ভালো । কাজেই পরে হয়ত আরো বড় কোনো সংস্থায় কাজ পেয়ে যাবে । আর নামী পর্ণ

স্টার হয়ে উঠবে । একবার হাতে অনেক পয়সা এসে গেলে লোকে আর মনে রাখে না কারো অতীত । লোকে ঝলক,টাকা আর দানধ্যান দেখে । কাজেই এমন সময় নেমে পড়লে বাচ্চাগুলো বাঁচবে আর হাতে অঢেল অর্থ আসবে ।

এদের গুন্ডাবাহিনী থাকে তাই ওকে কেউ বিরক্তও করবে না । আর শ্রীকিষণ্ ভগবৎ গীতায় কী বলেছেন?

কাজ করে যাও । ফলের আশা করোনা । কোনো কাজই ছোট নয় । কে কী দৃষ্টিতে দেখছে সেটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট । লোলিটা তো নিষ্পাপ শিশুদের ভরণ পোষণের জন্য এটা করছে । আর ওর বাবা কাউকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়েছে । তাতে লোলিটা কী করবে ? সমাজ ওকে কেন দায়ী করছে ? ইত্যাদি ।

আর পর্ণোগ্রাফি না থাকলে সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে । সেক্স করার আগে ইরেকশান হয় কী করে ? হরিমটর খেয়ে ? না পর্ণো দেখে কিংবা ভেবে ! যেসব মানুষ লম্বা লম্বা বুলি কপচায় তারাই গোপনে ডার্ক ওয়েব দেখে ।

আসলে সবারই নিজের নিজের লজিক থাকে কোনো কাজ করার ।

লোলিটাকে লোকে হোম ব্রেকার বলছে বটে কিন্তু মধুর তো ওর স্ত্রীকে গিয়ে সব খুলে বলেছে । ডাইভোর্স চেয়েছিলো । স্ত্রী না দিলে সে কী করবে ? লুকিয়ে তো বিয়ে করেনি লোলিটাকে ? ইত্যাদি ।

অবশেষে লোলিটা হয়ে উঠলো এক পর্ণস্টার । তার বাবার ইগোর জন্য । কালচারের নীচতার জন্য । শিশুকেও বলি দেওয়া চলে যেখানে, নিজের ইজ্জৎ রাখতে সেখানে নীচতার সংজ্ঞা যে ভিন্ন হবে তা আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখেনা ।

আরেক মেয়ে বিদিশা , একজন সাহেবকে বিয়ে করেছে । তার বয়স অনেক । আগের স্ত্রী পলাতকা । তার কারণ লোকটির স্বভাব । জিনিসপত্র জমিয়ে রাখে ঘরে । কিছুতেই ফেলবে না । শেষকালে এমন অবস্থা হয় যে ঘরে মেঝে বলে কিছু দেখা যায়না । সমস্ত মেঝে কাগজের টুকরো , বই, যন্ত্রপাতি আর দড়ি ইত্যাদি দিয়ে বোঝাই করা । সেগুলোর ওপরে লোকটি শুতো । গ্যারেজে গাড়ি নেই । আবর্জনায় ভর্তি । গাড়ি থাকে রাস্তায় । মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টিতে, ভয়ানক আকারের

শিল্ পড়ে পড়ে গাড়িতে ফুটো অবধি হয়ে গেছে । তবুও সে ঘর গোছাবে না ।

প্রথমা স্ত্রী চলে গেছে বলে বিদিশা ওকে করুণা করতো । দয়া দেখাতো । পরে ওর বৌ হিসেবে নিজেকে সমর্পণ করে ।

হামিরের স্ত্রীর ; এই দুই জামাইকেই অপছন্দ ছিলো ।

যেই মেয়ে বিদিশা, দিনে চারবার পোশাক বদলাতো সে এখন এক বুড়োর খপ্পরে পড়ে আবর্জনার মধ্যে শোয় । জামাকাপড় ধুতে কয়েন লন্ড্রিতে যায় ।

মধুলিকা , মধুরের ঘর ভাঙার বিপক্ষে ছিলো । সেখানেও আজ জটিলতা । মেয়ে লোলিটা- পর্ণস্টার হয়েছে ; ভালো কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে ওকে ।

সেও মায়ের কথা শোনেনি । অন্যের ঘর ভেঙেছে ।

কথায় অবশ্য বলে যে প্রায়শ্চিত্ত করাটা বেশি জরুরি । তাই বোধহয় সে মধুলিকাকে বলে যে পরে পর্ণ ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে সে নাকি প্রিস্ট হয়ে যাবে ।

এমন এমন সব রিলিজিয়াস্ সেক্টর আছে যেখানে ওদের মতন মানুষদের সাদরে গ্রহণ করা হয় ।

ওর বান্ধবী , যে ওকে এই ফিল্ডে আনে সেই প্রিসিলাও নাকি এক রিলিজিয়াস্ সেক্টরে যোগ দিয়েছে । শান্তির বার্তা প্রচার করে ওরা । লোকের বাসায় গিয়ে গিয়ে ।

Eckhart Tolle এর বইয়ের, উদ্ধৃতি দিয়ে লোককে ইম্প্রেস করে । তাদের জীবন বদলানোতে সাহায্য করে । ভয়েস্ ইন ইওর হেড্ ইজ নট ইউ । তুমি হলে সাক্ষাৎ গাট ফিলিং । কাজেই নিজের সন্তানকে বাঁচাতে কেউ যদি এসব পথে পা দেয় তা হয়ত সেরকম জাজ্ করার মতন কিছু নয় । প্রিসিলা বলে ।

কাজ তো গেছে হামিরের স্ত্রী, মধুলিকারও । শিক্ষিকা থেকে সেও পথে পথে ; স্বামীর কারণে ।

কিন্তু ভদ্রমহিলা কুপথে না গিয়ে কুকুরের হোটেল খুলে বসে । মানুষ যখন ভ্রমণে যায় তখন কুকুরকে হোটেলে দিয়ে যায় । কারণ কেনেলে অনেকে অত্যাচার করে । হোটেলে ভাড়া বেশি আর টিভি, খেলার জায়গা ও খেলনা থাকে । কুকুরের আলাদা ঘর আছে । ওরা টিভি দেখে ডাকে । গান করে হেড়ে গলায় ।

পুঁজি দিয়েছিলো তখন এক বন্ধু । সে মেমসাহেব । **বলে :: হামিরের কাজের জন্য তোমাকে দায়ী করা অন্যায় । তুমি কী করবে ? তুমি কী ওর সাথে গেছো না বলি দিতে বলেছো ? তোমরা দুজনে তো আলাদা মানুষ !**

বান্ধবীর দেওয়া লোন্ নিয়ে কুকুরের হোটেল খুলে চালাচ্ছে মধুলিকা । নামটা ভারি মজার ।

বেস্ট ফ্রেন্ড্ ।

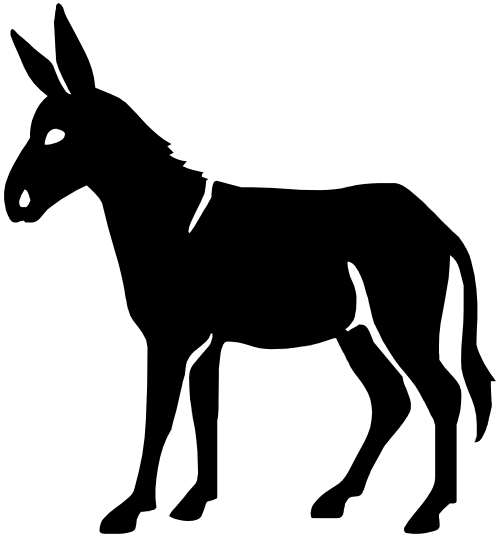

কুকুরও কত গুরুত্ব পায় অথচ মানুষ পথভ্রষ্ট হলেও কেউ কেয়ার করেনা ।

আজ তার মেয়ে অন্যদিকে গেছে কিন্তু তাতে কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ।

কুকুরের মালিক ; তাদের জন্মদিন পালন করে । বহুমূল্য কেক্ কাটে । গলায় গ্যাস বেলুন ঝুলিয়ে সামান্য উচ্চতায় ওদের ওড়ায় । মজা করে ওদের নিয়ে । আর মানুষ ; কোন সে অজানায় পা বাড়ায় দু:খ ভুলতে , এক মুঠো খাবারের আশায় ।

নিজের হোটেলে যেসব কুকুরেরা থাকে, তারা যেমন টিভি দ্যাখে, সেরকম খেলে বেড়ায় আনমনে । কোনো কোনো কুকুর আবার টিভি স্ক্রিনের পেছনে গিয়ে দেখে আসে যে কোথার থেকে এই অন্য কুকুরগুলো টিভিতে আসছে !

কোনো কোনো হেল্প ডগ্ আবার ফ্রিজ খুলে খাবার খায় । শুঁকে ; খাদ্য বেছে নেয় । মজার ব্যাপার ।

মধুলিকার আরেক মেয়ে আছে । নাম তার সোনাল । সে একটা ক্ষুদ্র বাসায় বসবাস করে । সেখানে বারান্দায়, নানান চাষ আবাদ করে থাকে । একের পর এক সার দেওয়া টব । একটা সারি হয়ে গেলে গ্যালারির মতন ওপরের দিকে বসানো । পাশে নয় । একটার ওপরে আরেকটা । স্থানাভাবে । সেরকম করেই বিরাট কিচেন গার্ডেন করেছে সোনাল । সেসব বাজারে বিক্রি করে । নিজের বাগানে ফলানো ফসল নিজে খায় । বলে কীটনাশক নেই এতে ।

অন্যদেরও দেয় । মাঝে মাঝে রান্না করে বিভিন্ন রাস্তায় গিয়ে বিক্রি করে । অফিস ফেরৎ মানুষ বেশি কেনে । সবকিছু মাত্র ৫ ডলারে দেয় । মাঝারি সাইজের বক্সে ভরে বিকিকিনি সারে । ক্লায়েন্ট অনেক হয় । ভারতীয়রা বেগুনির মতন জুকিনি, কচু, বাঁধাকপি, বিট্ আর ক্যাপসিকাম্ ভাজা খায় । মেমসাহেবরাও খায় ।

এইভাবে সোনালের জীবন কাটে । **কাজেই হামিরের কাজের জন্য তার বিশেষ ক্ষতি হয়নি মেয়েদের মধ্যে ।** তবে ক্রেতারা ঠিকুজি কুষ্ঠি না দেখলেও মেয়ের নিজের একটা মন:কষ্ট থাকেই । দিদিরা সবাই ভুগছে । কেবল সে ভালো আছে । তাই একটা অপরাধবোধ জন্মায় যেন তার !

এটা মনে হয় মা ; মধুলিকার । মুখে কিছু না বললেও চেহারায় ফুটে ওঠে । মা সবই বোঝে । বাচ্চার মনের কথা ।

সোনালের আবার আরেকটি পরিচয় আছে । পরবাসে, উন্নত ধরণের ভিসা পাওয়ার জন্য, অনেকে এখানে এসে নাগরিকদের বিয়ে করে । সেটা একটা ব্যবসা । সোনাল এরকম নানান লোককে বিয়ে করেছে । কারো সাথে থাকেনা সে । কেবল নিজের সিটিজেন স্টেটাস্ খানি ব্যবহার করে- ক্রেতাকে বর হিসেবে সই করতে দেয় ফর্মে ।

তার জন্য মোটা টাকা নেয় ।

ওর এজেন্ট আছে । সে এক সাক্ষাৎ সত্যিকারের রোবট । অবশ্য তার নামধাম আছে । নাম মকরধজ্জ মেহেটো ।

সেই এজেন্টের মাধ্যমে লোকে যোগাযোগ করে থাকে । সমস্তটাই হয় এখন অনলাইন ।

ঢালো কড়ি, পরো মুকুট ! টাকা দাও ও বৌয়ের সই নাও ভিসার ফর্মে । **বৌ--এখানে নাগরিক, সেই হিসেবে তুমিও ভিসা পেয়ে যাবে ।** পরে দেশে লিগ্যালি

ঢুকে ভিসা বাড়াবে । কারণ বৌ তো সাক্ষাৎ দ্রৌপদী ! কেউ তাকে পায়না ! কেবল সই পায় ।

সোনালের তাই অনেক নাম, খাতায় কলমে ।

কোথাও হেমাবতী কোথাও তারিণী তো কোথাও প্রেরণা !! মধুলিকার এটা শির:পীড়া হলেও কিছু করতে অক্ষম সে । মেয়েরা বড় হয়েছে । তারা বাবা ও মাকে কেয়ার করেনা যদিও বাবার অপকর্মের জন্য তাদের, সমাজের সিঁড়িতে আজ নেমে যেতে হয়েছে ।

সোনালের ,এতবার বিয়ে করা সত্ত্বেও সত্যিকারের বিয়ে তো হয়নি । ওর কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই ।

এক আদিবাসীকে মন দিয়েছিলো । সে ট্যাক্সি চালাতো । পরে অবশ্য দেশে ড্রাইভারবিহীন ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে তার কাজ চলে যায়।মনোমালিন্য হয় সোনালের সাথে । সে নতুন করে ট্রেনিং নিয়ে ট্রেন চালক হয় কিন্তু সেখানেও চালকহীন ট্রেন চলতে শুরু করে ফলত: বেকার হয়ে নানান অবসাদে ভুগতে শুরু করে মানুষটি । নাম তার জিজি । সেই জিজির সাথে সম্পর্ক শেষ হলে সোনাল আর এসব পথে পা দেয়নি । এখন

বার বার বিয়ে করে রোজগার করা ওর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে । আর সত্যি সত্যি অবিবাহিতা থাকা ওর পেশার স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারি ।

একরাতের বৌ আর কি!তবে এক্ষেত্রে বৌকে ;বিবাহিত পতিরা চোখের দেখাও দেখেনা ।

স্ত্রী এখানে হল পত্রলেখা । পর্দানসীন । কর্পূরের মতন । উড়ে যায় । শুধু গন্ধ পাওয়া যায় ।

সোনাল নাম্নী এই বাষ্প ,অনেক বায়বীয় সত্ত্বাকে দেহ দেয় । তারা একটা পরিচয় পায় । এটাই সোনালের কৃতিত্ব ।

চালক বিহীন যানবাহন চালানো শুরু হলে অনেক মানুষ বিশেষ করে যারা আদিবাসী , তারা সংগ্রাম শুরু করে । তাদের বেকারত্ব বাড়ছে এতে । ওরা তো তেমন উচ্চশিক্ষা নেয়না । আবার নতুন করে অন্য ফিল্ডে কাজ শুরু করা ওদের পক্ষে একটু কঠিন হয়ে পড়ে । দলে দলে সংগ্রাম করতে শুরু করছে ওরা ।

দেখার বিষয় এখন সরকার বাহাদুর কী করেন !

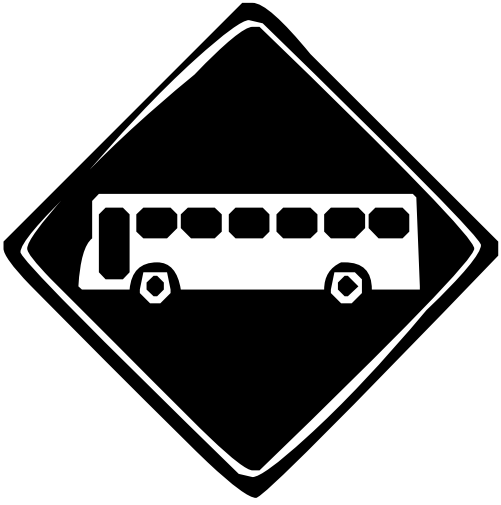

দলে দলে আদিবাসী, আত্মহত্যা শুরু করলো । যানবাহন তারাই চালাবে । শীতের রাত-- বড় বড় অফিসের সামনে ওরা পাহারায় বসলো । নতুন কর্মী ; যারা এইসব বিশেষ ট্রেনের ও বাস ইত্যাদির ব্যাপারে জানে তাদের ঢুকতে দেবেনা অফিসে ।

লাঠি , ছুরি, বুমেরাং ইত্যাদি নিয়ে সবাই পালা করে পাহারা দিচ্ছে । সোনাল- জিজির জন্য এখনও মনে একটা সুক্ষ্ম আবেগ ধরে রেখেছে । কাজেই সেও হাজির হয় ঐ আদিবাসীদের প্রতিবাদের আসরে ।

এখানে পার্টনার, অন্যত্র চলে গেলেও অনেক মানুষ যোগাযোগ রাখে । জিজি এমনিতে ধনী । আসলে নিজেদের জমিজমা বিক্রি করে শহরে এসেছিলো । তখন চালকের কাজ নেয় । এমনিতে ব্যাঙ্ক ফ্যাঙ্কে অনেক অর্থ । জিজি , সোনালকে বলেছে যে তার বিয়েটা জিজিই দেবে । বিয়ের পার্টি ও অন্যান্য সব অনুষ্ঠান ও নিজেই করবে । ওদের সম্পর্কে ফাটল

ধরলেও আজও সোনালকে সে মিস্ করে । তাই জন্য এইসব দায়িত্ব হাসিমুখে নিতে রাজি ।

সোনালের মা অবশ্য বলে যে আগের জন্মে ও তোর বর ছিলো । নাহলে এত গভীর টান হয় নাকি আজকাল ?

সোনাল বলে যে গভীর টান যেখান থেকেই আসুক , যার প্রতি আসছে সে বুঝতে পারেই । **একেই বলে চাঁদের ওপরে রাহুর ছায়া ফেলা । গ্রহণ । কেটে গেলেও অনেকটা সময় অবধি তার রেশ থেকেই যায় ।**

জিজি , রাহু-কেতুর গল্প শুনে খুব মজা পেতো । বলতো যে ওদের মধ্যেও এইধরণের অনেক গল্পকথা চালু আছে । আসলে দুনিয়ার নানান কোণে মানুষ-- মহাকাশ , মহাজাগতিক চেতনা ও নক্ষত্রপুঞ্জের রহস্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে এগুলি আমাদের নাগালের বাইরে । তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদাহরণ বিভিন্ন লোকসমাজে প্রচলিত আছে ।

কোন সে এক গুণী মানুষ বলেছেন না ::: প্রকৃতির মধ্যে বসে তার জন্মরহস্য জানা যায়না । প্রকৃতির বাইরে কী আছে জানার জন্য সেই বাইরেটায় যেতে হয় ।

যখন কোনো বোদ্ধা বলেন আমরা মেনে নিই । যখন জিজি বলে আমরা হাসি ।

সেই জিজিকে সমর্থন করেই আজ সোনাল এই মহাযজ্ঞে অংশ নিয়েছে --- বিকেলে ভোরের কুঁড়ি হয়েই ।

সম্পর্ক হয়ত আগের মতন নেই ,আসলে দায়িত্ব নেই আর কোনো কিন্তু মনের গভীর টান আছে, আছে দৈহিক স্পর্শের মধুর যোগও ।

ভোলা কী এতই সহজ ?

----এখন আর আমাদের মধ্যে কিছুই নেই ; এটা অনেকেই বলে থাকে, বিচ্ছেদের পরে কিন্তু যা ছিলো তাকে কী এত সহজে ভোলা যায় ? অনেকে এইসব গভীর সম্পর্ক নিয়ে যায় পরের জন্মে । জাতিস্মর হয়ে । এমনই বাঁধন মনের । **হয়ত কাঁকন বাজে করুণ সুরে , পরের বারেও ।**

কত মানুষ আছে যাদের আমরা চিনি না , কোনোদিন দেখিও-নি অথচ তাদের সান্নিধ্য আমাদের একটা বিশেষ শান্তি দেয় । তাদেরকে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে । নিজেকে ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে চৈত্র-লগ্নের ঝরাপাতার মতন । লুকিয়ে রাখে মানুষ কত আবেগ

কিন্তু স্বপ্নে সে আসে । আসবেই । যতই বাস্তব জগতে মুখ ঘুরিয়ে থাকুক ; লোকলজ্জার ভয়ে ।

মনের এইসব বদভ্যাসের কথা কেউ জানেনা ।

তবুও প্রতিটি মানুষেরই হয়ত এরকম গোপন ডাইরি থাকে । সেই পাতায় আঁকা থাকে কতনা মধুর সংলাপ ! **তাই বুঝি অনেকে, তাদের নতুন সাথীকে বলে থাকে :: কাকে কাকে আমি ভালোবাসি তাই দিয়ে কী হবে ? তোমাকে তো ভালোবাসি আর সেটাই চরম সত্য !**

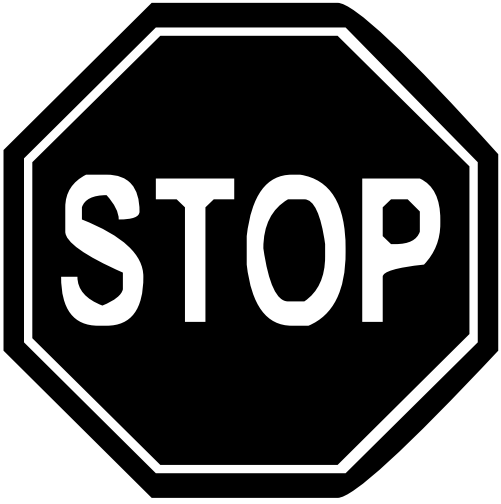
STOP

আদিবাসীদের আত্মহত্যা বেড়ে গেছে বলে, সরকার পক্ষ থেকে তাদের বিশেষ প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা মূলস্রোতে গা ভাসাতে পারে ।

অনেক শিক্ষা তারা ফ্রিতে পেয়েছে ।

অনেকে খুশি আবার নবজীবন পেয়ে । অনেকে অখুশী পুরাতন পেশা হারিয়ে । আসলে সবরকমই থাকে কেষ্টর দুনিয়ায় । এই বৈচিত্র্যই ভুবনকে আলোময় করে । নানা দৃষ্টিকোণ ও সংস্কৃতির মেলা মানব জীবনকে সমৃদ্ধ করে । তবে কিশোর ও শিশুদের বলি দেওয়া , কেউ দাড়ি স্পর্শ করলে এক চরম অবস্থা যা কোনোমতেই সমর্থণ করা যায়না ।

মানুষ মাত্রই ভুল হয় । আর ওরা তো অবুঝ !

ওদের তো ক্ষমা করতেই হবে । আর কোনো মানুষের অহং-ই ; অন্য কোনো প্রাণীর জীবনের থেকে বেশি মূল্যবান নয় । কাজেই হামিরের ফেরার অপেক্ষা অনেকেই করছে ।

বিদেশী মেয়েকে ছলনায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি দেওয়া সত্যি ঘোরতর অন্যায় ।

আজ বহুবছর কেটে গেলেও লোকে এই ঘটনা ভোলেনি । সবাই অপেক্ষা করছে - কবে সে ফেরে ! ফিরবেই কারণ মেয়েরা আছে তো এখানেই ।

একদিন ফিরবেই ! হয়ত ঘটনাটা চাপা পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে । এরকম সবাই ভাবছে ।

আর সত্যি সত্যি হামির একদিন ফিরেও এসেছে !

অনেক বয়স হয়ে গেছে তার । মেয়েরাই প্রায় বুড়ি হয়ে গেছে ! হামিরের বয়স অনেক হয়েছে তবুও গাট্টাগোট্টা আছে । তবে তার স্ত্রী , মধুলিকা- বয়সের সাথে সাথে স্মৃতি হারানো রোগের প্রকোপে প্রায় একটা লাম্প হয়েই বেঁচে আছে । কাউকে চিনতে পারেনা । বিয়ে হয়েছে তাও ভুলে গেছে । মেয়েরা, নাতিনাতনি ,

জামাই , বন্ধুবান্ধব কেউই আর তার মন আয়নায় ছায়া ফেলেনা । সব ভুলে গেছে ।

নিউরোনের ভুলে, মানুষটি শুধু বেঁচে আছে খাতায় কলমে । না আছে কোনো বোধ আর না কোনো কাজ করতে পারে । ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ।

মধুলিকা যার নাম ; তার জীবন পুষ্পে আজ আর কোনো মধু নেই । সবটাই তেতো ।

দু:খের তিক্ততা । সময়ের তিক্ততা ।

মানুষ থেকে গাছে রূপান্তরিত হবার তিক্ততা !

স্বামী তো অনেক কাল হল দেশে গিয়ে আর ফেরেনি । কিন্তু মধুলিকা এখানে বসেও, মেমসাহেবদের মতন দ্বিতীয় কারো গলায় বরমাল্য দেয়নি ।

একাই থেকেছে । সন্তানদের মুখ দেখে । তাদের দেখে বারবার মনে হয়েছে হামিরের কথা । তবুও বুকে পাথর চেপে জীবন যাপনে মন দিয়েছে । জীবন নির্মম!

আজ শেষ সোপানে এসে বসে পড়েছে,সে এসেছেও তবুও পতিদেবকে চিনতে পারেনি ।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে হামিরের দিকে !!

তা সত্ত্বেও পথভোলা হামির , নিয়ম করে মধুলিকাকে দেখতে গেছে , একসাথে প্রাতরাশ খেয়েছে । লাঞ্চ খেয়েছে । মধুলিকা কিছুই বোঝেনি তবুও হামিরের দিক থেকে কোনো গাফিলতি নেই ।

লোকে হয়ত প্রশ্ন করেছে যে- এতো কিছুই বোঝেনা তবুও তুমি আসো কেন ?

হামির হেসে বলেছে :: হয়ত বোঝেনা । কিন্তু আমি তো সবই বুঝি !

মেয়েরা কেউ এসেছে, কেউ আসেনি বাবার কাছে ।

যদিও বলি দেওয়ার এই প্রথা ওদের সমাজে আছে, তবুও বিদেশিনীকে নিয়ে গিয়ে প্ল্যান করে বলি দেওয়া তাও এমন এক কারণে যার কোনো লজিক নেই , ওদের পিতৃদ্বারের পথ থেকে বিমুখ করেছে ।

ওদের বাবার জন্য ওরা লজ্জিত । মোহিত নয় ।

তবুও হামিরের এই ফেরা অভিনব । কারণ সেই মেয়েটির পরিবার তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে । অনেক বছর তো হয়ে গেছে । হিংসা ও লড়াই মনে রেখে ওরা আর ঝামেলা বাড়াতে চায়না ।

আর হামির- সোজা ওদের বাড়ি গিয়ে, ক্ষমা চেয়েছিলো । পায়ে ধরে । বলেছিলো, যে নিজেদের ইগো রাখতে এই প্রথা ব্যবহার করেছে ; বংশমর্যাদার কারণে । তবে মেয়েটিকে এমনি মারেনি । লাশ জলে ভাসায়-নি ! মেয়েকে ; এক জীবন্ত ঠাকুরের কাছে বলি দিয়েছে ।

এই ভাগ্য সবার হয়না । বলি, সচরাচর পাঁঠা কিংবা হাঁসের হয় । কখনো বা কোনো মানুষ , দেবীর পাদপদ্মে নিজের শিরচ্ছেদের হুকুম পায় । কাজেই সে বিশেষ ক্ষমতাশালী !

মেয়েকে ওখানে বলি দেওয়াতে সে অপার্থিব জগতে অনেক উঁচু ধাপে উঠে যাবে । নিজের জীবন দিয়েছে সে দেবী অর্চণার কারণে ।

এইসব বোঝানোতে মেয়েটির বাড়ির মানুষ হামিরকে ক্ষমা করে দেয় । প্রতিশোধের কঠোর প্রতিজ্ঞা , কলহ বাড়ায় । কি হবে, যে চলে গেছে তার জন্য আরো কিছু মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ? বরং এই ঘটনার যাতে আর কোনোমতেই পুনরাবৃত্তি না হয় সেরকম কিছু করাই বাস্তবে সমস্যার সমাধান করা।

আর হামির তো বলেছে যে স্তোত্রপাঠের সাথে সাথে , স্বাহার হোমশিখার স্পর্শে মেয়েকে বলি দেওয়া হয়েছে

। কাজেই সে আর সাধারণ মেয়ে নেই ! স্বর্গীয় কোনো এক গন্ধর্ব হয়ে গেছে । কাজেই এই নিয়ে ওরা আর লড়াই করতে চায় না ।

তবে সরকার তো আবেগে চলেনা । চলে লজিকে ।

ওদের সমাজে এইসব বলি প্রথা ও তার মহাজাগতিক বিশ্লেষণের বিশেষ মূল্য নেই । ওরা প্রেজেন্ট লাইফে বাঁচে । কাজেই হামিরের সাজা হবেই ।

শুধু মেয়েটির পরিবার- তাকে মুক্তি দেওয়ায় ও ক্ষমার আলোয় ধুয়ে দেওয়ায় , শাস্তি অনেক কম হবে ।

পরিবারের মানুষ এটাকে উদাহরণ হিসেবে দেখাতে বলেছে । যে একটা মৃত্যুর জন্য অন্য কোনো মৃত্যু আবশ্যক নয় । বরং যা প্রয়োজন তাহল ফুটো থালা সারানো । সমাজের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে ,সমাজ ওড়নাকে মায়াময় ও নিপুন করা !

হামিরের ; প্রতিদিন নিয়ম করে মধুলিকার কাছে যাওয়া ও তাকে খাওয়ানো , স্নান করানো ও সঙ্গ দেওয়া ইত্যাদি সরকার বাহাদুরের নজর এড়ায়- নি ।

কাজেই ওরা বুঝেছে --একই হামির, বংশমর্যাদার কারণে ঐ মেম-মেয়েকে বলি দিলেও অন্তরে অতি কোমল । মধুলিকা যেমন আর পুরুষসঙ্গ করেনি সেরকম হামিরও আর নারীসঙ্গ করেনি । এটাও ভালো ও শিক্ষনীয় ।

আজও সে, স্মৃতি হারানো পত্নীর কাছেই বাঁধা আছে ।

সাত কেন সাতশো কোটি পাকে !!! ট্রু-লাভ তাকে আজও আকর্ষণ করে । তাই বুঝি ধরা পড়বে জেনেও ফিরেছে নিজের বাসায় ! স্ত্রীর কাছে । জানার পরে যে মধুলিকা স্মৃতি হারিয়েছে ।

এজন্য নয় যে পত্নীর কিছু মনেই পড়বে না তাই হামিরের বলি দেওয়াকে ভুলে গিয়ে সহজ হবে মধুলিকা-- বরং এই কারণে যে শেষের সেই লগ্নে যাতে তাকে ছুঁয়ে যেতে পারে মধুলিকা । কারণ এখন হামিরের সব দেবার পালা ! তিন কন্যার জননী , বৃদ্ধা মধুলিকার কাছে তার আর কিছু চাইবার নেই ।

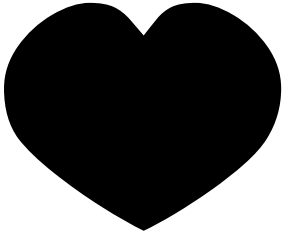

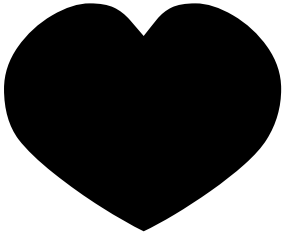

মুঠো মুঠো পাপড়ি

অন্তরা

মা মারা যেতেই বুঝেছে মেয়ে

কী ছিলো আর এখন কী নেই !

এখনও সবুজ গাছের ডালটা ঝুলে আছে সুন্দর

কিন্তু তাতে কোনো পুষ্প নেই !

এই হল সেই মা ; যার স্পর্শ পেয়ে , অ্যাসিড মেয়ে সুস্থ হত সাঁঝ সকালে ! আজ মায়ের আঁচল হয়ে ওকে ঢাকে-- পথের কুকুর ছানা

কারণ বাসা বলে আজ আর কিছু নেই !

সাইক্লোন

সাইক্লোনের পূর্বাভাস পেয়েই ছুটেছে ইন্দর ,

নিয়ম করে বৌ পেটানো ; যে ঝড়ের সৃষ্টি করে

বংশধরের মনে , তার খবর কে রাখে ?

সাইক্লোনের যারা ভিকটিম্ , তাদের কল্যাণে

অশেষ শুভ , এরকমই ভাবে ইন্দর !

মারের চোটে বৌয়ের হাড় পাঁজরায় যে সঙ্কোচ,

তাতেই ফালাফালা হয় উঠোন চত্বর !

তবুও আবেগে জর্জরিত মিঠে ইন্দর দেখো ----

সেই সাইক্লোনেই ভিড়েছে !!

পূর্বাশা

পূর্বাশা হাউজিং-এ যারা আছে,

শেষ সম্বল ওখানে ঢেলেছে

----- এই কটি চামড়া কুঁচকানো

মুখের সর্বস্ব **কেড়ে নিতে তুমি বদ্ধপরিকর ।**

এরজন্যেই তুমি গেলে কামাখ্যা , সোমানাথে ;

করলে যজ্ঞ- সন্ধ্যা ও প্রাতে ।

মানত না ফললে মুখে ক্রোধের ফণা !

কেন হে ? একচিলতে রোদ্দুরও তুমি ওদের দেবেনা ?

সায়াহ্নে

সায়াহ্নে মনিষা রোজ বিষ খায় ।

তারপর পয়জন বিভাগে তাকে নিয়ে যায় !

সকাল হলে, আঁধার নিভলে-- চেনা চেনা
উজ্জ্বল হলুদ আলোতে আবার বিষ খায় !

সুস্থতায় ফিরলে আবার নিয়ম করে---

বৃদ্ধাশ্রমে কেন যে কেউ মরেনা কেবল এই
প্রশ্নের উত্তর চায় !

সংস্কৃতি

যেই সমাজে বাবা ; লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে

গুপ্ত পথে তরবারি শানিয়ে- নিজ মেয়ের

কুমারীত্ব পরীক্ষা করে ,

তাকে তুমি সংস্কৃতি বলো ??

যদি বলো , তাহলে নিজেকে আর মানুষের
বাচ্চা না বলে বরং জানোয়ার বলো !!

**-----দাঁড়াও ! হয়ত জানোয়ারও কিছু
শালীনতা মেন্টেন করে !**

দার্জিলিং

দার্জিলিং-এ থাকার সময় আমি রমজান দেখেছি । দেখেছি নেপালী মেয়েদের ভাই- টিকা ,

কুকুর তিহার, কাক তিহার

আর হিন্দুদের মহা-উৎসব , দীপাবলি !

এছাড়াও দেখেছি জৈন সভা ,

বুদ্ধের মনাস্ট্রিতে জপমালা হাতে বিবিধ অনুষ্ঠান !

ড্যান্স ফ্লোর আলাদা হলেও ডি-জে একই ;

আমার এরকমই মনে হয়েছে !!

শ্যাম্পেন

শ্যাম্পেনের কেবল নিন্দা করো ,

ওদিকে ইজাবেলা আর ডোরা ,

নিত্য রাতে শ্যাম্পেন খেয়েই ভুলেছে নিষ্ঠুর জগৎ !

ওদের চোখের সামনে , বাবা ও মাকে

কুপিয়ে মেরেছে উগ্রদল ! তাই ওরা দুজন,

এখন শ্যাম্পেন সরবৎ খেয়েই সুস্থ আছে !

মদ

চন্দ্রোদয় ; এক নরেশ যে খালি মদ খায় ।

মদ , মদ আর আরো মদ !!

সকাল সন্ধ্যা বিকেল রাত্রি

রাজকন্যারা সবাই আসে

হাতে নিয়ে মৃত্যু বাঁশি !!

অপরূপ রং দিয়ে আঁকা মায়াবী পেয়ালা ভরে

শুধু দিয়ে যায় মদ আর মদ আর মদ !!

চন্দ্র ; ডুবে যায় মদ পালঙ্কে ! মদ গদিতে !

পরীরা মদ পালক বুলিয়ে ওকে ঘুম পাড়ায় !

আর বালিশ হিসেবেও দেয় মদ , মদ আরো মদ !

ইলার মা

বেগুনি আর রাধা-বল্লভি ভাজে ইলার মা

প্রতিদিন উত্তর কলকাতার ভগ্ন ফুটপাথে ,

হাতিবাগান আর শোভাবাজারের আনাচে কানাচে

চাউমিন রাঁধে ইলার মা ! দিনে ও রাতে ।

এত যে উন্নয়ন , পর্যটন ---

তবুও সকাল থেকে বিকেল অবধি

আবার বিকেল থেকে গাঢ় নিশা ! ইলার মা এটা সেটা ভাজে , কারণ জীবনটাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে !

সানাই

রম্ভাকে চেয়ে পায়নি বলে অ্যাসিড মেরেছে
রোমিওর দল !

আসলে রম্ভা এক ঘরোয়া মেয়ে ,

সে সুন্দরী হলেও আকন্ঠ অপ্সরা নয় !

তারও বিয়ে হয় এক যুবকের সাথে যার মাথায়
ছিট্ আছে বলেই বোধহয় রম্ভাকে তার পরী
মনে হয় । সে আবার ফ্যাশান গুরু !

রম্ভা এখন লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল ঝাড়বাতির

মাঝে হাঁটাচলা করে , যাকে ফ্যাশান শো বলে ।

এসব শোতে মানুষ পোশাক দেখে ,

মডেলের , গলে পড়া মুখ দেখেনা !

হার্ট

তোমার নাকি প্রেশার নর্মাল ,

ইসিজি একদম ঠিক !

অর্থাৎ তোমার হার্ট আছে আর কাজ করছে সাবলীল !

তাহলে ঐ গরীব ভিখারিকে অত গালাগালি দিলে কেন ?

দেখছো না, ও চোখের জ্যোতি হারিয়েছে !

নরম

বলতো দুনিয়ায় সবচেয়ে নরম কী ?

পালক ----হল না !

ফুল ---হল না !

ক্রিম---হল না !

আরো তিনটে চান্স দেবো ।

রসমালাই , কুশন আর আর জোছনার মিহিন আলো !

এবারও হলনা । **সবচেয়ে নরম ও কোমল হল নারীর স্পর্শকাতর জাদুকরী মন ।**

লৌকিক

জাদুকর ঋতেশকে বলি,

---এত যে জীবনে তোমার অলৌকিক ;

তার মাঝে মাটিকে স্পর্শ করতে পারো ?

জাদু শানিয়ে দেশ বিদেশ হল ; ইন্দ্রানী এক
বৌও পেলো ! তবুও মাটিকে কি ছুঁলো ?

ঋতেশ হুলো ?

আমি বলি কি,

জাদুকর থেকে এখন বিন্দু আকরিক হও ,
জীবনটাকে প্লিজ একটু লৌকিক করো !

রূপবতী

রূপের আগুনে পোড়ে প্রায় সবাই।

এমন হতে হতে অবস্থা চরমে !

রূপসী দেখলেই লোকে দমকল ডাকে !

সুন্দরী , নিজ মাধুরী নিয়েই মশগুল ।

বলে :: লোকে আমায় কিন্নরী করে !

এক যুবকের চক্ষু:শূল , রূপসী মোহরগুল--

চাটি মেরে কিন্নরীকে মানুষ করে , নগরপাড়ে !

মুখে বলে :: তোমার দর্পণ মোছার এবার সময় হয়েছে , **নাচ মেরে বুলবুল** ।

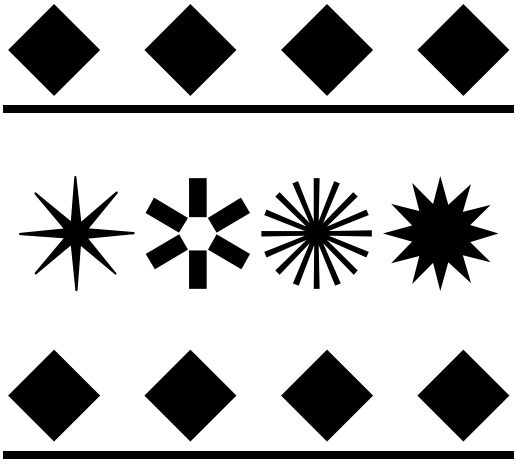

মিসেস আনন্দ

কোনো আনন্দ যজ্ঞে আর নেই মিসেস আনন্দ !

তীর্থ করতে গিয়ে সর্বহারা

মিসেস আনন্দ ; আজকাল আন্তর্জালে

ভিক্ষে করে ।

নানান ইস্যু নিয়ে কেঁদে কেটে

ফান্ড পেজে টাকা তোলে ।

তবুও ইমেল কোম্পানি ওকে ;

আনন্দশীলা নামে কোনো একটা টিকিট দিয়েছে !

যেখানে বাঘের ভয়

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে

ভোরের আলো কিংবা পূর্ণিমাও হয় !

কারণ পাওনাদার আমাকে দেখে ;

তেড়ে না এসে ও পাওনার হিসাব না মিটিয়ে ;
নিজের ছেলের বিয়ের মেরুন রং এর নিমন্ত্রণ
পত্র দিয়েছে !

এই পাওনাদারের নাম বিবেক

আর আমার ধার করা অর্থের নাম কলঙ্ক !

উপপতি

স্ত্রীকে ফুলের পাপড়ি দিয়ে ঢেকে রেখে

যে পতি বাঈজী নাচায় ,

তাকে আর যাই বলো পতি বলো না !

সঙ্গম করে সে বরনারীকে নিয়ে- নৌকোর
লুকানো কোণায় !

তাকে আর যাই বলো নববিবাহিত বলোনা !

বাঈজী নাচাতে নাচাতে পা নাচানো

এইসব আবর্জনার নামই বোধহয় কোনো
পন্ডিত, **চরিত্রহীন দিয়েছেন !**

অন্য শায়েরি

উইলিয়াম ; রোজ কাক ভোরে

গাড়ি হাঁকিয়ে যায় কাজে ।

আরো কিছুক্ষণ পরে

ওর গপ্পী বৌ রবীন্দর ,

উনুন ধরিয়ে -শেঁকে তোলে বাসি রুটি !

আরো একটু পরে উইলিয়াম বাসায় ফেরে ,
যেমন ফেরে ক্লান্ত পাখি !!!

ততক্ষণে রবীন্দর ;

পেট ভরে রাজ্‌মা চাউল খেয়ে

ঘুমিয়ে পড়েছে ।

তফাৎ হল---উইলিয়াম সুখে আর রবীন্দর
ভীষণ আনন্দে মানে শান্তিতে আছে !

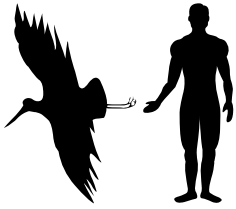

ইমোশান্স্

আমার ইমোশান্স্ গুলো সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ,

ভয়, লজ্জা, রাগ, দংশন ইত্যাদিরা

এমন সেজেগুজে দাঁড়িয়েছে

যে লোকে ওদের ঘুঙুর বলে ভুল করে !

ওদের মিঠে বোল আর দু:খের হরতাল

সবাইকে ভুল পথে চালিত করে !

সবাই ভাবে আমার দু:খ অসুখ করেনি বলেই আমি মহাসুখে !!

এবার আমি ড্যাশবোর্ড থেকে সমস্ত ইমোশান্স্ ডিলিট করে যেই না দিয়েছি ,

অমনি সবাই বলছে যে এখন আমি সুখে কিংবা অসুখে কিংবা মহাসুখে ইত্যাদি ,

যা ইচ্ছে - **ক্রসওয়ার্ড অথবা পাসওয়ার্ডে থাকতে পারি !**

ঝাঁপি

এই যে আমি এখন কম্পিউটারের

ঝাঁপি বন্ধ করবো

তাই বলে কী ভেবেছো আমি ভাবনার রসে

পুড়বো না ?

মাথার ভেতরে কড়কড় করে

ডেবিট কার্ডের নোট !

কবিরও পয়সা লাগে । কবি কাঁদে , হাসে আর গান গায় ! ঠুম্‌রি , গজল নাহলেও কবির যে গান তাকে জীবনমুখীই বলা যায় !

কবিও মানুষ ।

তার দর্জি লাগে , নাপিত, হরিয়ালি

আর আরুণী , আল আর শ্বাপদের বুলি ।

কবির ব্যাথা লাগে , কবি মূর্চ্ছা যায় !

এবার কবিকেও একটু মানব করে, স্পর্শ দিও !

চিল

চিল শকুন না থাকলে

মেথরের কাজ করে কে ?

ওরা অসম্ভবকে- সম্ভব করতে

ময়লা ও মৃতপশু ভক্ষণ করেই বেঁচে আছে ।

ওদেরকেও মাঝে মাঝে --

ম্যাকডোনাল্ড আর কে এফ সি দিলে ক্ষতি কি ?
ওরাও- সুস্বাদু খানা

লাইক , শেয়ার আর সাব-স্ক্রাইব্ করে !!!

পোষ্য

পোষা কুকুরের আমি ; চাবকে পিঠের ছাল

তুলে দিই ! ও প্রথমে কুঁইকুঁই করে ,

তারপর কাঁদে !

তখন আমি লাঠি দিয়ে ওকে মারি

এমন মারি যে ভেঙে পড়ে পাশের বাড়ি !

এবার ওর ছাল- চাম্‌রা তুলে দিয়ে ওকে নিয়ে
ফুটবল খেলি ! তবুও ও আমাকে ছাড়েনা ।

এবার পড়ে আছে কেবল ওর হাড় পাঁজরা ,

সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে আমি ডুগডুগি বাজাই !

তবুও সে আমাকে ছাড়ে না ।

আমিই বরং ওকে দেহ ছাড়া করি !

এবার প্রেত হয়ে ও আমাকে অনুসরণ করে !

----আর আমি ওর অবিনশ্বর প্রেমে ;

জ্বলে পুড়ে মরি !!

মতিয়া

মতিয়া এক একশো বছরের বুড়ি ;

ছিলো অঢেল সময় হাতে,

অসময় ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়েও অনেকটা সময় থেকে যায় তার রঙীন প্রাতে ।

আর অনেক ভক্তের শাখা প্রশাখা , অনেক ফলোয়ার !

মতিয়া একাই থাকে আর রাঁধে, বাড়ে

লোকে ওর খুব প্রশংসা করে , বিশ্ব জুড়ে !

মতিয়া এতদিনে বুঝেছে সে যে কেন যমেরও অরুচি !

প্রখ্যাত এক টিভি চ্যানেল ,

ওকে নেমন্তন্ন করেছে বুঝি ,

লাইভ রেঁধে দেখাতে ;

শতবরষের পুরনো বাঁধাকপি-কুচি !!

ভীমরতি

কবিদের ব্যঙ্গ করো ?

বিজ্ঞানী কবিতা বোঝেনা তাতে কবির কী ?

এই যে বিজ্ঞানীর ভীমরতি হয়েছে ,

জঞ্জাল খাচ্ছে কপাকপ্ করে ,ইলেকট্রনিক্ , মোবাইল আর এক্স-রে রিপোর্ট , বিজ্ঞানী গিলছে দেখো কপাকপ্ করে , ঐ দেখো !

বুড়োমানুষের ভীমরতি হয়েছে , খাদ্য ছেড়ে অখাদ্য কুখাদ্য ------!

আচ্ছা , কবিরা এসব পাগলামি দেখলেও ,

এই নিয়ে কাউকে কিছু বলেছে ?

সাঁকো

হাওড়া ব্রিজে কত সিনেমার শুটিং হল,

কত ডকুমেন্টারি ,

কত শত পর্যটক এলো, গেলো ।

ইতিহাসে স্থান পেলো ।

হাওড়া ব্রিজেও ঘোস্ট হান্টিং ট্যুর ,

সাঁকোতে রং চং , আর্ট আর অযাচিত দেওয়াল লিখন , রক্তকরবী অভিনীত হল ।

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে স্বর্ণ মুকুটের মতন যে সাঁকো , সেখানে পানের পিকে কত লোক ডুবলো !

তবুও আশ্চর্য এই সাঁকোর প্রথম কারিগরকে কেউ মনে রেখেছে ?

তারও তো একটা হৃদয় ছিলো !!

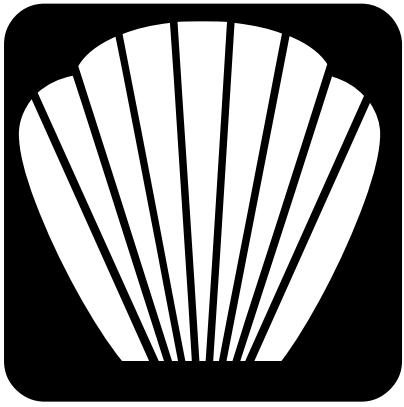

চোকু বাঈজোর দৃষ্টিকোণ

শুধুমাত্র স্ল্যাং বা গালির শব্দ বাঁচিয়ে রাখার জন্য

লড়ছে যে কিশোরটি , তার বিপ্লবকে কেউ
ভালো চোখে দেখেনি ।

সবাই বলছে , বাজে শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত,
কথামালা হবে মধুর বচন ;ফুলের ফুলঝুরি --
- নয় শব্দকোষের বিভাবরী ।

কিন্তু যে কিশোরটি বাচ্চা বয়স থেকে বাড়িতে

গোল রুটি বেলে , সবজি কেটে-

মা কে রসুইঘরে সাহায্য করতো ,

মিরিকের পাহাড়ি চালে , নীল পাহাড়ের

রূপালী ঢালে , তার খাড়ু পরা মা হিমরাতে

মোজা পরতো না , রূপার খাড়ু ঢাকা পড়ে যাবে বলে ।

সেই পা-গুলো যখন কাটা পড়লো অজানা অসুখে , তখন পাহাড় থেকে এই সরল বালককে তুমি আনলে তুলে ; আশ্রয় দেবার ছলে---কলকাতার কল্লোলে । চোকু বাঈজোর পরবর্ত্তীকালের জীবন যাপন সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভালো ।এখন যুবক বয়সে ; লুঠপাট করে ওর অবস্থা ফিরেছে । এখন ও প্লেনে চড়ে ; এবার ভোটেও দাঁড়াবে ।

তবে এখন কি আর মধুমতী ও মধুর ভাষণের অবকাশ আছে ?

স্ল্যাং এর বদলে ?

পরকিয়া

নীলাঞ্জনা নয় , দুলছে হাওয়ায়

নীলাঞ্জন উপাধ্যায় ।

এই মানুষটি পরবাসী- তা অনেক বছর ।

লোকে ওকে ডাকতো বলে নাটা

তাই ওর পেশা হল আটা ।

গম পিষে আটা বার করে রুটি বানায়,

আটার লেচি পাকিয়ে তাকে টেনে বাড়ায় ।

এইভাবে চলতে চলতে নীলু বা নীল ধরলো
অন্যপথ । **নীল এখন পদ্মকলি ফেরি করে ।**

তাই লোকে এখন নাটা নয় মাঝারি বলে ।

পদ্মফুলের বোঁটা সবুজ ;ফুল প্লাস বৃন্ত দুইয়ে মিলে মাঝারি হাইট ।

পরের চ্যাপ্টার ::: নীলাঞ্জন এখন- শখের কথা বলা পুতুলকে, নিজের স্বর ভাড়া দেয় ।

হাজার হাজার কথামালা ওর গলার শব্দে শোনা যায় । জীবনও ওকে টেনে লম্বা করে ।

এখন লোকে ওকে অভিজাত ও সুপুরুষ বলে ।

আমার ওকে ভালোলাগে আর আমি ওকে নিয়ে

জীবন্ত স্বপ্ন দেখি , মনে হয় আমার পাশে বসে আছে মহাজাগতিক নীলপাখি !

এই নীল নাটা, মাঝারি কিংবা লম্বা নয় ।

এই নীলু -সমুদ্রনীল । এর না আছে শেষ না শুরু নিয়ে সংশয় ।

ওর হাস্কি ভয়েস আর গভীর চোখের ফ্যান আমি

ওকে নিয়মিত প্যাথোলজিক্যাল কিস্ করি ।

তবুও আমাদের পার্থিব জগতে মিলন অসম্ভব ।

কারণ নীলু বিবাহিত , ওর একটা নয় দুটো নয়

একবারে তিন তিনখানা বৌ আছে !

আমিও নাছোড়বান্দা -- আমাকে ভুল বুঝোনা ,

আমি নীলুকে কেড়ে না নিয়ে আমার মেশিনে ;
ওর একখানা কপি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি ।

এরপরে ওর ক্লোনের বীর্যপাত হলে

আমি ননস্টিক প্যান নিয়ে হাজির হবো আর

ল্যাবে গিয়ে এটা ওটা মিশিয়ে ওকে নীলুবাবা করবো ।

লি চাচা

লি চাচা নাকি অবসর নিয়েছে !

সকালে বাগানের ঘাস , বিকেলে মিল্ককলোনির দুধ , সকালে পাউরুটি আনা , বিকেলে ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি নিয়ে দিন কাটায় যে লি চাচা

সে নাকি অবসর নিয়েছে !

পরশু মারা গেলো লি চাচা ।

মৃত্যু ওদের কাছে দু:খের কিছু নয়

কারণ ওরা বংশ পরম্পরায়,

মৃত্যুর ব্যবসা করতে ফিউনেরাল হোম্ চালায় ।

তাই ওর ছেলে --ওকে আগুনে দেবার আগে ওর পেসমেকারটা নিলো খুলে । নাহলে চুল্লি নাকি বিস্ফোরণে যাবে জ্বলে ।

আবার ভ্রূ পল্লবে কুঞ্চন কেন? সব গেলো নাকি রসাতলে ?

লি চাচার নাম ছিলো অমিয়ভূষণ জনসন লি ,

কেবল নাম শুনেই সব ভেবে নিলি ??

চোখদুটি বড় বড় আর মুখখানি মধুময় !

আমি কখন বলেছি যে লি চাচা হিন্দু নয় ??

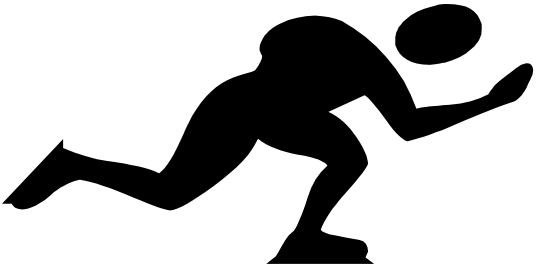

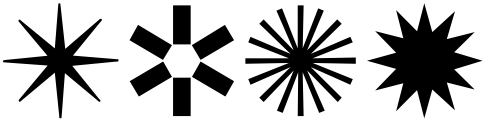

মেহুলি

মেহুলির জন্ম মামাবাড়িতে ।

লেখাপড়া শিখতে পারেনি অল্প বয়স থেকে ।

মামার বাড়ির গাধার খাটনি আর মাঈমার বচন

হজম করে মেহুলি বড় হয়েছে ।

এসব শরৎবাবুর গপ্পে অনেক পড়েছি !

কমিউনিকেশান এক বিপ্লব !

মেহুলি এখন ওর ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যাথেমেটিক্স
পড়ানো ভাইকে ধরে, অনেক ইউ-টিউব ভিডিও

বানিয়েছে । বিশেষত্ব তেমন নেই-- এই তাওয়া
ঝকঝকে করার কায়দা অথবা বাতপীড়া
কমাবার নিয়মাবলী ।

তবুও মেহুলির আজ বিশ্বজোড়া নাম হয়েছে ,

যাকে একদিন লোকে ঝি ইত্যাদি বিশেষণে
ভূষিত করেছে আজ তারই টুইটার আর
ইন্সটাগ্রাম সামলাতে হিমসিম্ ওর কাজিনেরা ,

মেহুলি এক থেকে অনেক হয়েছে ।

মেহুলির কাজিনের বাচ্চারা এখন ওদের বাবা
মায়ের গায়ে হাত তোলে ,

এদিকে মেহুলির একটাই ছেলে !

সে সহনশীলতা আর নম্রতার জন্য

আই-জি নোবেল পেয়েছে ।

মেহুলি কেমন বদলে গেছে ,

বৈদ্যুতিক শিহরণ আর বিজলীর পরশে ।

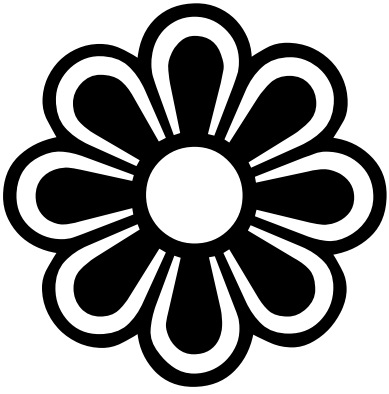

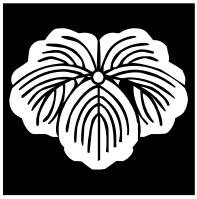

ঝরা পাতা :

আমি সুদূরের পিয়াসী । স্বেচ্ছায় হইনি হয়েছি বুকের ভেতরে এক জ্বালায় । আমি ছিলাম বাবা মায়ের এক মেয়ে , ঘোর কৃষ্ণবর্ণ , ঘোলাটে চোখ । তাই ছিলাম অনাদরের বড় অনাদরের । সকালের রোদ যেমন দাঁতহীন সেরকমই আমিও ছিলাম নিস্তেজ , বিবর্ণ ।

ছিল একটি সুন্দর সতেজ মন আমার । তাই নিয়েই বেঁচে ছিলাম আমি , ঐ কুৎসিত পরিবেশে । বাবা

মায়ের বকা ঝকা , গালিগালাজ আমাকে কষ্ট দিলেও চুপ করে সব সইতাম । মনে মনে ভাবতাম একদিন হয়ত আমি ভালো চাকরি নিয়ে সুদূরে চলে যাবো আর এখানে আসবো না । আমার ভাইও খুব কালো কিন্তু ওকে বাবা মা কিছু বলতেন না ।

আমার যা রেজাল্ট তাতে করে আমাকে মেধাবী বলবেন সবাই । তাই হয়ত একদিন চড়ে বসলাম বিমানে । চললাম সব পেয়েছির দেশ আমেরিকায় , গবেষণার কাজে ।

আমার বিষয় জ্যোতির্বিজ্ঞান । গ্রহ নক্ষত্র আমাকে শান্তি দিতো । তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতাম মাটিতে নামতে চাইতাম না । তাই বিদ্যার বিষয় বেছে নিলাম ঐ সাবজেক্টকে । গো প্লাস এষণা অর্থাৎ গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে চলতো লেখালেখি । ভালো ভালো কবিতা ও গল্প লেখার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়লাম অনেক ওয়েব পত্রিকার সাথে , লেখা দিতাম ছাপা হত কিংবা হতনা । কিছু একটা হত । অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করতেন তাতে অন্যের হিংসা বাড়তো । এইভাবে আমি এগিয়ে চলতে লাগলাম । একদিন আমার বই বার হল একটি ওয়েবসাইট থেকে ।

খুব ভালো লাগলো । নিজে জড়িয়ে পড়লাম একটি অ্যাফ্রিকান ছেলে ভিভিয়ানের সাথে ।

ভিভিয়ান আমাকে খুব ভালোবাসতো । ওর আগের স্ত্রী লোর্ণা ওকে ছেড়ে চলে যায়নি , মারা গিয়েছিলো । ভিভিয়ান তারপর থেকে একলা । ভারি একলা ।

আমরা মিললাম সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে । প্রথমে ওকে আমার খুব অহংকারী মনে হলেও পরে জানলাম বেশ ভালোমানুষ । আসলে নেটে তো মানুষ চেনা সহজ নয় !

এইভাবে আমরা বিয়ে করলাম । কিন্তু ভিভিয়ানও ধাপ্পা । ভীষণ ধাপ্পা ।

আমাকে চরম অপমান করতো । আসলে ও কোনো কাজই করেনা । খালি মদ খায় আর ড্রাগ্স নেয় । আমাকে কাজ করে ঘর দুয়ার সামলে চলতে হত তারপরে ওর মুড অফ হলে মারধোর দিতো আমাকে । আমার টাকায় খেলেও আমার কোনো স্বাধীনতা ছিলনা । এইভাবে আমি মুষড়ে পড়লাম । যেই বাড়িকে চিরতরে ছেড়ে এসেছিলাম সুদূর পরবাসে সেই বাড়িকেই আঁকড়ে ধরলাম । ভাই এলো বিদেশে । আমরা একসঙ্গে থাকতে লাগলাম । মায়ের সাথে ফোনে কথা হত । মনের বরফ গলে জল ।

দূরত্ব মনে হয় নিকটত্ব বাড়ায় । আর ছিলো চ্যাট রুম । তাতেই খুঁজে নিতাম আনন্দ ।

আবার পেলাম নতুন মানুষ তবে চ্যাটে নয় , পথে । যেতে যেতে বাসে । বেড়াতে বেশ ভালো লাগতো । একা একা চলে যেতাম নানান জায়গায় সেরকমই এক জায়গায় দেখা পেলাম সুব্রতর । সুব্রত খুব ভালো মানুষ । খাঁটি সোনা যাকে বলে । আবার ডুব দিলাম প্রেম অরণ্যে । আবার বিয়ে । এবার পাকাপাকিভাবে চলে এলাম দেশে , কেরালায় ।

সুব্রত বাঙালী হলেও অনেককাল কেরালায় ছিলো । ওর বাবা ছিলেন ওখানের ফিশারিজে ।

আমাদের একটি মেয়ে হল । নাম দিলাম আদিরা । আদিরা খুবই স্মার্ট মেয়ে ।

কালো হলেও একটা চটক আছে চেহারায় । দক্ষিণীরা দেখলাম কালো নিয়ে বেশ ভালো পরিমানেই হাসাহাসি করে । যেন মেঘ বেশি কালো না ভ্রমর !

আমার মেয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হল । মন হল উদার , বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় গড়ে উঠলো চরিত্র ।

দৃঢ় , ঋজু । কিন্তু নদীর ওপাড় কহে ছাড়িয়া নি:শ্বাস !

হ্যাঁ এই বিয়েও সুখের হয়নি । একদিন ভ্রমণ করতে গিয়েই সব তচনচ হয়ে গেলো ।

আমরা গিয়েছিলাম সি -বিচে । সেখানে অর্ধ নগ্ন মহিলা দেখে দেখে আমার তৎকালীন স্বামী সুব্রত যেন কেমন হয়ে ওঠে ! চরম বেপরোয়া ও ইরেস্পন্সিবেল ।

একটি রোদপোয়ানো মেয়েকে ও ধর্ষণ করে ফেলে । তাতেই বিপত্তি । আবার আমি একা । আমি ওকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সুযোগ দেয়নি । আমার ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে ও হোটেলের ঘরে আত্মহত্যা করে । আদিরা আর আমি একদম একা হয়ে গেলাম । এইসব দেখে শুনে আদিরা বিয়ে করতে রাজি নয় । **ও সারাজীবন একা থাকতে চায় । ভয় পায় বিয়ে কে , কমিটমেন্টকে নয় , ভয় পায় বেড়াতে ।**

ঐ ঘটনার পরে আমরা দুজন আর কোথ্থাও বেড়াতে যাইনি । ছুটির দিনে আমরা ঘরে বসে লুডো খেলি কিংবা সুডোকু করি । একঘেয়ে লাগলে ওয়েবসাইট খুলে ভ্রমণ কাহিনী পড়ি । কিন্তু কোথ্থাও আর যাইনি । **মনে পড়ে যায় নির্মম ও ব্রতচ্যুত সুব্রতকে ,**

আমার , আমাদের মেয়ে , আমাদের আদর -আদিরার ।

††††††††††††††††††††††††

The EnD

The end